মহাপ্লাবনের ঊনিশ দিন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নিসর্গের অভ্যন্তরে

১৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। কালো স্লেটের উপর পেন্‌সিলে অনেকটা জায়গা এলোমেলোভাবে ঘষলে যেমন দেখায় আকাশটা ছিল সে রকম। গ্রামে জন্ম। গ্রামেই বেড়ে উঠেছিলাম। তাই আকাশের চেহারা দেখলেই ঠিকঠাক টের পেয়ে যাই আবহাওয়ার হালচাল। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এমনই সেপ্টেম্বরে কত বার কলকাতা থেকে দুশো মাইল পাড়ি দিয়ে দিব্যি পৌঁছে গেছি আমার জন্ম-গ্রাম খোশবাসপুরে। প্রতিবারই গিয়ে দেখেছি উজ্জ্বল রোদ। ঘন সবুজ আর চিকন হয়ে ওঠা গাছপালা। ১৬ বছর আগে ঐ গ্রামের প্রান্তে অনেক সাধে ও প্রযত্নে যে ছোট্ট বাড়িটি করেছিলাম, তা প্রকৃতপক্ষে একটি বিশ্রামাগার মাত্র। ইংরেজিতে 'রিসর্ট' বললেই মানিয়ে যায়। চারদিকে ফুট ছয়েক উঁচু পাঁচিল। তার উপর কাঁটাতারের বেড়া। গেটটা একটা গাড়ি ঢোকার মতো প্রশস্ত। ভিতরে চারদিকেই দেশি-বিদেশি উঁচু-নিচু গাছ আর থরে বিথরে ইতস্তত যেন প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো লতা-গুল্ম। আসলে, আমি কলকাতার হল্লা-জেল্লা-ভিড় আর মুদ্রিত বর্ণমালার জটিল জগৎ থেকে ঐ পারিপার্শ্বিকে কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপন করতে চেয়েছিলাম। অজস্র পাখি, প্রজাপতি আর কীটপতঙ্গের সঙ্গী হতে চেয়েছিলাম। এবছর ১৭ই সেপ্টেম্বর দিনটি বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, সেদিন রবিবার। আজকাল যখন তখন রাস্তা অবরোধ হয়। সেদিক থেকে রবিবারটা সত্যিই একটা ছুটির দিন। আমার বাহন একটি সেকেন্ড-হ্যান্ড ক্রিম-রঙা অ্যাম্বাসাডার। তার ড্রাইভার আনোয়ার বয়সে তরুণ। সচরাচর জাতীয় সড়কগুলি এদেশে তত নিরাপদ নয়। আনোয়ার এত বছর ধরে সব দেশি-বিদেশি গাড়ি আর ভীষণ-দর্শন অতিকায় ট্রাকগুলিকে পিছনে ফেলে তীরের মতো এগিয়ে গেছে, নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে আমার প্রিয় 'রিসর্ট'-এ। এই যাত্রা তাই আমার কাছে এক অপরূপ অর্কেস্ট্রার মতো। এবার সঙ্গে ছিলেন শুধুই গৃহিনি। রাস্তার অবস্থাও ছিল মোটামুটি ভালো। সারাপথ সেই একই ঘষা আকাশ, কখনো কদাচিৎ কোথাও কয়েক ঝলক রোদ। সকাল সাড়ে আটটায় বেরিয়ে বহরমপুর পৌঁছে গেলাম একটা নাগাদ। সেখানে থেকে ভাগীরথীর ব্রিজ পেরিয়ে জাতীয় সড়ক চলে গেল উত্তর দিকে। আমরা চললাম বাঁ-দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কান্দিগামী সড়কে। এখান থেকে দূরত্ব মোটে ১৮ কি.মি.। পৌঁছতে মিনিট তিরিশ

লাগলো। এই পথে যেতে যেতে শরৎকালে বরাবর যেমন দেখেছি জল-ভরা বিস্তীর্ণ বিল, এবারও তেমনই দেখলাম। তারপর চড়াই ভেঙে সমৃদ্ধ গ্রাম-নগরী গোকর্ণ পেরিয়ে ডানদিকে দ্বারকা নদীর অববাহিকায়, দূ-রে পশ্চিমে চোখে পড়েছিল আমার ছেলেবেলার প্রিয় প্রকৃতি জগৎ, যেখানে ঝিলমিল করছিল আবার একটি বিল।

তার মানে, সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল আরও অনেক সেপ্টেম্বরের মতো। আবছা নিশ্চল হালকা মেঘের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল আসন্ন বিকেলের রক্তিম রোদ। সেই গোপন 'রিসর্ট'-এ ঢুকে মনে হল সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। চারপাশ থেকে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ফিস্ ফিস্ করে উঠল, এস। কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে হেঁটে বেড়ালাম কী এক বিহ্বলতায়। পশ্চিমের ছোট্ট গেটের নীচে বিশাল পুকুরের জল অন্যবারের মতই হয়ে উঠল একটি নীরব অভ্যর্থনার হাসি। এসবের মানে, আমি বলতে চাইছি ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল।

বিভীষিকার পদসঞ্চার

সে রাতে কখন বৃষ্টি হয়েছিল টের পাই নি। গত বিশ বছর ধরে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুই। গৃহিনি চা নিয়ে ঘুম ভাঙালেন, তখন সকাল আটটা। বাইরের ছোট্ট বারান্দায় গার্ডেন চেয়ারে বসে বাসিমুখে চা খেতে খেতে দেখলাম আমার সাজানো বাগান রাতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। ঘাসে শিশিরের মতো জলকণা মেঘচিরে-আসা রোদের ছটায় মুক্তোর মতো ঝিলমিল করছে। সহসা লক্ষ করলাম, পূর্বে বড় গেটের নীচে গ্রামের রাস্তায় ব্যস্ত হয়ে নানা বয়সী মানুষ যেন মিছিল করে চলেছে। সেই সঙ্গে কানে এলো সেই এলোমেলো মিছিল থেকে ভাঙা-গলায় বিলাপের সুর। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো কথা 'হায়! হায়! সব গেলো গো, সব গেলো।''

চমকে উঠলাম। কার কি গেল? আর কিসেরই বা এ মিছিল? না—মিছিল নয়, এ যেন বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত আর অতি ক্লান্ত এক মানব-প্রবাহ। তখনই উঠে গেলাম গেটের কাছে। নানা বয়সী মানুষ, তাদের কাপড়-চোপড় ভিজে গায়ে সেঁটে গেছে, কারো মাথায় বস্তা, কারো হাতে তালপাতার চাটাই, কেউ টেনে আনছে গরু—ভেড়া-ছাগল, কারো কোলে শিশু কিম্বা হাঁস-মুরগি। আমাদের গ্রামটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ, প্রায় সাড়ে তিন কি.মি.। দক্ষিণে ঢালু মাঠ নেমে গেছে দ্বারকা নদীর দিকে যে-নদীর ওপারে, দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ নিম্নভূমি এবং সেই নিম্নভূমির পুরোন নাম হিজল বিল, যার পটভূমিকায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। আমিও অপুট হাতে লিখেছিলাম 'হিজলকন্যা' নামে একটি উপন্যাস। সেই মুহূর্তে টের পেলাম সুবিস্তীর্ণ হিজল এলাকার জলপ্লাবন থেকে পালিয়ে আসছে এই সব মানুষ। আমাদের গ্রামটি উঁচু মাটিতে অবস্থিত। এর পায়ের কাছে পৌঁছয় এমন বন্যা আমি তো দেখিই নি, কস্মিনকালে কেউ যে দেখেছেন তার প্রমাণও পাই নি। গ্রামের পশ্চিমে কান্দি-বহরমপুর

পাকা সড়ক। তারপর ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে মাটি মিশেছে দ্বারকা নদীর অববাহিকায়। গ্রামের পূর্বদিকেও তাই। ধাপে ধাপে নেমে মাটি মিশেছে একই নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকার নিম্নভূমিতে।

এই সময় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র রফিক ছুটে এসে বলল, 'সমুদ্র, সমুদ্র, দেখে যান সমুদ্র আসছে।' আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল গ্রামের রাস্তার পূর্বদিকে আমার পৈতৃক বাড়িতে। বাড়ি থেকে পূর্বে আমাদের একটা বাগান। বাড়ি সংলগ্ন। বাগানের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে সে আঙুল তুলে দেখাল উত্তর-পূর্ব দিকটা। বলল, 'দেখছেন?'

কিছুক্ষণের জন্যে আমি হতবাক। সারা শরীর অবশ হয়ে গেল আতঙ্কে। যে দিগন্তে এতকাল ধরে দেখে এসেছি ধূসর গ্রাম-গ্রামান্তরের দীর্ঘ এক রেখা, তুলির মোটা দাগের মতো। কিন্তু কোথায় তা? হালকা, স্থির, মেঘে-ঢাকা দিগন্ত মাটির সঙ্গে মিশে আছে আর অবিকল ঝড়ের সমুদ্রের মতো উত্তাল তরঙ্গের পাঁচিল একটার পর একটা এগিয়ে আসছে আর আসছে।

সেই সময় শুধু আমরা একাই নই, দীর্ঘ গ্রামটির পূর্বপ্রান্তে ভিড় করে দাঁড়িয়ে অজস্র মানুষ সেই বানের সমুদ্র দেখছিল। ততক্ষণে আত্মরক্ষার সহজাত বোধ আমাকে অস্থির করেছে, এখনি পালাতে হবে, না হলে ঐ উত্তরঙ্গ সামুদ্রিক বিভীষিকা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গিয়ে মিশবে পশ্চিমের অন্য এক অববাহিকায়।

ঘড়ি দেখিনি। অনুমান করি হয়তো পাঁচ-মিনিট বা সাত মিনিট বা দশ মিনিটও হতে পারে, সেই বিভীষিকা এসে থেমে গেল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার প্রায় দুশো মিটার দূরত্বে। তরুণ রফিক বলল, 'আপনি কি ভয় পেয়েছিলেন? আমি জানতাম ঐ সমুদ্র কিছুতেই আমাদের গ্রামকে ছুঁতে পারবে না। যদি ছুঁতে পারত তাহলে কি হতো জানেন? সারা পশ্চিমবঙ্গ তলিয়ে যেত অতল জলে।'

এবার সে আমাকে নিয়ে চলল গ্রামের পশ্চিমে কান্দি-বহরমপুর পাকা সড়কের দিকে। যেতে যেতে দেখলাম ওদিকেও সেই সমুদ্র এসে ছুঁয়েছে রাস্তার পিচ্ রাস্তার ধারে যে পাড়াটি ছিল সেটা পুরো ডুবে গেছে, মাটির ঘর সব ধ্বসে গেছে, এমনকি ওখানে গ্রামীণ জল সরবারাহ প্রকল্পের যে ট্যাঙ্ক আছে তা থেকে আমাদের গ্রামেও জল সরবরাহ করা হয় এবং সেই জন্যে রাস্তার ধারে একটা পাম্পঘর আছে, সেটা বন্যার জলে পুরো ডুবে গেছে। তার মানে, আমাদের গ্রামে জল সরবরাহ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ। ফেরার পথে কর্ণসুবর্ণ রোডে, যে রাস্তাটি কান্দি-বহরমপুর সড়ক থেকে আমাদের গ্রামের উত্তর দিয়ে চলে গেছে, যেতে যেতে দেখলাম, আমাদের গ্রামের চেয়ে উঁচুমাটিতে অবস্থিত গোকর্ণের পূর্বপ্রান্তে বন্যার জল থৈ থৈ করছে। পথেই শুনলাম, ওখানেও কয়েকটি মাটির বাড়ি ধ্বসে গেছে।

বলা দরকার, তখনও আকাশ হালকা মেঘে ঢাকা থাকলেও বৃষ্টির ছিটেফোঁটা ছিল না। এমনকি আমার বাড়িতে ফেরার পর প্রায় সারাটা দিনই বৃষ্টির দেখা পাইনি।

কেন একে বলেছি ''বিভীষিকার পদসঞ্চার'' তার তত কিছু ব্যাখ্যার দরকার নেই। শুধু এটুকুই বলতে পারি, এযাবৎকাল দ্বারকা নদী অনেক ভয়াল বন্যা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেই বন্যার জল তার অববাহিকা থেকে এক ইঞ্চিও উঁচুতে উঠতে পারে নি। তাই আমি এই বন্যাকে বলতে চাই এযাবৎকালে সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়া এক সামুদ্রিক বিভীষিকা।

একশো কুড়ি ঘন্টার দুর্যোগ

১৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার একটু পরেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গাছপালার ফাঁকে চোখে পড়ল এক ফালি ঝলমলে চাঁদ। অমনি মনে হল, কালই দেখব রোদ ঝলমল দিন আর বন্যার জলও আগেকার আরো সব বন্যার মতো সেদিনই সরে যাবে। গৃহিনিকে ডাকলাম, 'এস চাঁদ দেখে যাও।' তিনি সহসা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে চাঁদ দেখতে ডাকছো? তোমার মাথায় এটুকুও আসছে না যে বন্যা এই গ্রামকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে সে কতখানি সর্বনাশা? তুমি জানো, এখন চারদিকে শুধু কান্দি মহকুমা নয়, সারা মুর্শিদাবাদ জেলায়, এখন তোমার ঐ চাঁদ ওঠার সময়, কি সব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে? সকালে উঠে বিজয়নগর গ্রামটি খুঁজে দেখো। দেখতে পাবে না। আমি উত্তর-পশ্চিম কোণে গ্রামটি খুঁজেছি। দেখতে পাইনি।'

বুঝতে পারলাম, আজ সারাদিন তিনি পাড়াপড়শি মানুষজন এবং তাঁর দেওরদের সূত্রে এই ভয়াল বন্যার সব বিবরণ খুঁটিয়ে জেনেছেন।

এরপর তাঁর মুখে শুনতে থাকলাম অনেক শোচনীয় কাহিনি। সে সব কাহিনি খুঁটিয়ে বর্ণনার ইচ্ছে নেই। কারণ, তা এতই অবিশ্বাস্য, এতই মর্মান্তিক, এতই বীভৎস যে লিখতে গেলেই হাত কেঁপে ওঠে। টুকরো টুকরো সব 'এপিসোড' মানুষের বাস্তব জীবনে এমন সব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে তার নজির মুদ্রিত বর্ণমালার জগতে এখনো আত্মপ্রকাশ করতে পরেনি। মা একটি শিশুকে কাঁধে আর একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বাঁধের উপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে আসছে। অন্তত তিরিশ ফুট উঁচু সেই বাঁধ। হঠাৎ বন্যার প্রচণ্ড স্রোত উপড়ে নিয়ে গেল বাঁধটিকে। চিরকালের মতো হারিয়ে গেল তিনটি মানুষ। এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে এসেছে বন্যা-পলাতকা একটি মেয়ে। সে দাঁড়িয়েছিল দ্বারকা নদীর উঁচু ব্রিজের উপর। পরে, আমি নিজেই গিয়ে দেখেছি সেই বাঁধের নীচে গভীর খাদ। এ অবশ্য ২৮শে সেপ্টেম্বরের কথা যখন সেনাবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান ও স্বেচ্ছাসেবক বালির বস্তা ফেলে সেই বাঁধের নীচে কান্দিগামী সড়ককে যান চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা করছিলেন।

তো সেই ১৮ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে শুরু হয়ে যায় অন্য এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে কখনো টিপ্‌টিপ্‌ দুর্যোগ। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে কখনো টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি, কখনো একটানা ঝিরঝিরে বর্ষণ। টানা পাঁচদিন পাঁচরাত এই দুর্যোগ চলতে থাকল। বলা দরকার নেই যে, অসংখ্য বিধ্বস্ত গ্রামের ঘরের টিনের চালে কিম্বা উঁচু গাছের ডালে যারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের সময় কিভাবে কাটছিল। কয়েকটি গ্রাম নয়, হাজার হাজার গ্রাম। পরে স্থানীয় অনেক পত্রপত্রিকায় হিসেব বেরিয়েছে মুর্শিদাবাদের আড়াই হাজার গ্রাম এবং সাতটি পুরসভা এই ভয়াল বন্যার হিংস্রনখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

আমি এক ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ। হাঁটাচলার ক্ষমতা তত নেই। কিন্তু একদা শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবন অবধি শুধু মুর্শিদাবাদ জেলা নয়, পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য অঞ্চলে কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়িয়েছি। তাই এবছর কোথায় কোথায় বন্যা হয়েছে, তার খবর নানা সূত্রে পেয়ে একটা সুস্পষ্ট ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেরি হয়নি। তবে প্রসঙ্গত বলি, এতকাল পরে আমিও সস্ত্রীক বন্যা দুর্গতদের একজন হয়ে উঠেছিলাম। আতঙ্কে লোকেরা চাল বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল। বারো থেকে পনের টাকা কিলো দরে বোরো ধানের মোটা চাল নিছক আমারই খাতিরে কেউ কেউ বিক্রি করেছিলেন। মুদির দোকান থেকে আলু আর মসুরির ডাল চড়া দামে কিনতে হচ্ছিল। দুর্যোগের শেষদিকে তাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। ডালে বেশি করে জল দিয়ে আর সেদ্ধ আলুর একটা ঘ্যাঁট করে আমাদের খেতে হচ্ছিল। এদিকে রান্নার গ্যাসও গিয়েছিল ফুরিয়ে। গ্যাস আসে কান্দি থেকে, কান্দির রাস্তা ভেসে গেছে; কিভাবে গ্যাস আসবে? কেরোসিন কুকারে রান্না হচ্ছিল, কিন্তু কেরোসিনও দুষ্প্রাপ্য। নিছক আমার খাতিরে গোপনে প্রথম প্রথম বারো টাকা লিটার দরে, তারপর পনের টাকা, অবশেষে রাতের অন্ধকারে পঁচিশ টাকা লিটার দরে কেরোসিন এসেছে।

এদিকে আমাদের দুজনের ঔষধও ফুরিয়ে গেছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর ফিরব বলে মাত্র দশ দিনের ঔষধ নিয়ে গিয়েছিলাম। গোকর্ণে সে সব ঔষধ মেলে না। এতে অবস্থাটা বোঝা যায়, কী অসহায় আর হতাশ হয় পড়েছিলাম। আর কি কলকাতা ফিরতে পারব? ধরেই নিয়েছিলাম এরপর খাদ্যভাবে না হোক, প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাবেই আমাদের দুজনকে প্রাণে মারা পড়তে হবে।

২৩ শে সেপ্টেম্বর সকালে আকাশে রোদ ফুটলো। আকাশ প্রায়ই নির্মেঘ। কিন্তু তখন চারদিকে বন্যার্তদের ভিড়, স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠন থেকে তাদের খিচুড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। বন্যার্তদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে গোকর্ণ হাইস্কুলের দরজা। কতজনই বা সেখানে আশ্রয় নিতে পারে? অন্যদিকে, বন্যার জল হাত-কয়েক মাত্র সরেছে। প্রতিটি মুখেই এই প্রশ্ন এতকাল তো বন্যার জল দুই তিন দিনেই সরে যেত, এখনো কেন সরছে না? এই প্রশ্নই এ অঞ্চলে এযাবৎকালের বন্যার ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর প্রশ্ন।

যে বন্যা আমি নিজের চোখে দেখলাম তার বিশালতা এবং গতি আমার জ্ঞানমতে

সবচেয়ে মারাত্মক। দ্বিতীয়ত আমার জ্ঞানমতে, এই বন্যার জল সরে যেতে বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব বিলম্ব করছে কেন?

কিছু সংশয়, কিছু প্রশ্ন

গ্রামের বাতাসে যখন ভেসে আসা মৃত মানুষ ও জীবজন্তুর দুর্গন্ধে সারাক্ষণ গা গুলোচ্ছে তখন, ক্রমে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে এ বন্যা শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায় হয়নি, একই সঙ্গে বা কোথাও ঈষৎ আগে বা পরে ভাসিয়েছে আরো কয়েকটি জেলা— মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া, হুগলী ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অজস্র অঞ্চল। বিশ্বস্তসূত্রে আরো খবর পেলাম, মশানজোড় (ইংরেজিতে ম্যাসাঞ্জর) এবং তিলেপাড়া ব্যারেজের জলাধার থেকে নাকি অল্প সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তিনবার জল ছাড়া হয়েছিল। কত কিউসেক জল তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, এটা প্রত্যক্ষ যে, যে পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছিল, তা অতি দ্রুত আট-দশ ঘন্টার মধ্যেই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি নদ-নদী এবং এইসব নদ-নদীর শাখা-প্রশাখারূপী অসংখ্য খাল ও কাঁদর (কান্দার) ছাপিয়ে এক মহা প্লাবনকে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঠেলে দেয়। আর সেই মহাপ্লাবন প্রচণ্ড বেগে ভাগীরথীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর ভাগীরথী ছাপিয়ে তার পূর্বতীরবর্তী সমগ্র অঞ্চলকে ডুবিয়ে দেয়।

নদী বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই, আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ফরাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার পরই সারা বছর ভাগীরথী পূর্ণগর্ভা হয়ে থাকে। এরফলে, জলবাহিত পলি বছরের পর বছর জমতে জমতে ভাগীরথীর বুকে কোথাও চর সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গে ভাগীরথীর গর্ভও পলি মেশানো বালিতে ভরাট হয়ে উঠেছে। ফরাক্কা ব্যারেজ হওয়ার আগে ভাগীরথী কস্মিনকালে বন্যা সৃষ্টি করত না। বরং ভাগীরথী তার উপনদীগুলি এবং সংলগ্ন অববাহিকার অসংখ্য জল-নিকাশী খালের বাড়তি জল বুকে নিয়ে সমুদ্র-সঙ্গমে মিশে যেত। কারণ ভাগীরথীর বুক বছরে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস শূন্যই থাকত। যেটুকুই বা জল থাকত, তা কোথাও সেই জল বালির চড়ার মধ্যে ছোট বা বড় জলাশয় সৃষ্টি করত। আর সেই জল ছিল কী স্বচ্ছ! মনে পড়ে গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্না রাতে ভাগীরথীর সেই স্বচ্ছ জলে স্নান করা ছিল জীবনের এক অপরূপ খেলা। পঞ্চাশের দশকে যখন লোকনাট্য আলকাপ দলে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন ভাগীরথী তীরবর্তী গ্রামগুলিতে থাকার সময় ভাগীরথীর কাজলকালো জলে স্নান সব ক্লান্তি জুড়িয়ে দিত। এখানে একটা কথা বলা দরকার, একটা সামুদ্রিক জোয়ার পৌঁছত দাঁইহাট পর্যন্ত। পরে ক্রমে সামুদ্রিক জোয়ারের সঙ্গে ধেয়ে আসা বালি এবং অন্যদিকে ভাগীরথীর উৎস-মুখ পদ্মা থেকে বয়ে আসা পলি ও বালি ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশকে ভরাট করে তোলার ফলে জোয়ারের জল ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকে। ফরাক্কা ব্যারেজের ফিডার ক্যানেল থেকে সম্বৎসর জলপ্রবাহ চালু রাখার ফলেই সামুদ্রিক জোয়ার আরো পিছিয়ে

কোনোক্রমে নৈহাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ থেকে সাধারণজ্ঞান অনুসারেই সিদ্ধান্ত করা যায়, আর পঞ্চাশ বছর পরে পলিমাটি ও বালিতে ক্রমশ ভরাট হয়ে ওঠা ভাগীরথী হয় অন্যদিকে বাঁক নেবে হয়তো পূর্ব-পশ্চিম দুই তীরই প্লাবনে ধ্বংস করবে।

এই প্রশ্ন কি কারো মনে জানে না, কেন এ-বছর সেপ্টেম্বরে ভাগীরথী তার পশ্চিম তীরে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট উঁচুতে অবস্থিত রঘুনাথগঞ্জ শহরকে ডুবিয়ে দিল? বাঁশলই নদীর জলের পক্ষে এই প্লাবন সৃষ্টিকরা সম্ভব ছিল না। ওদিকে পূর্বপাড়ে জঙ্গীপুর শহর থেকে শুরু করে ভগবানগোলা, লালগোলা এবং ডোমকল অঞ্চলকেও ভাসিয়ে দিয়েছে। এটিকে বাগড়ি অঞ্চল বলা হয়। ভগবানগোলার পথে বাঁ-দিকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে কালুখালির বাঁধকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ভাগীরথীর এই অতিরিক্ত জল। সেখানে পাকা রাস্তায় পঞ্চাশ ফুট গভীর একটি বিরাট জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বহরমপুর শহরে বন্যা এক অভাবিত ঘটনা।

আগেই বলেছি, ভাগীরথী কোন কালেই বন্যাসৃষ্টিকারিণী নদী ছিল না। এবার দেখা গেল, সে বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি করেছে। কেউ বলতেই পারেন মশানজোড় এবং তিলেপাড়া থেকে হঠাৎ ছাড়া বিপুল জল ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ভাসিয়েছে এবং ভাগীরথী তাকে ধারণ করতে না পারায় পূর্ব পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করেছে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল—এতকাল যাবৎ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের বন্যাপ্রবণ উপনদীগুলির বুক ভাসিয়ে যেখান থেকে হোক, যেভাবে হোক যত জল আসুক না কেন ভাগীরথী সেই জলকে নিজের বুকে ধারণ করেছে এবং পূর্বতীরের কোনো শহর বা গ্রাম বা অঞ্চলকে একটুকুও ভাসায়নি। তাই হরে-দরে এই কথাটাই মেনে নিতে হয়, ফরাক্কা ব্যারেজ শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একটি বিপজ্জনক নির্মাণ।

স্বাধীনোত্তর যুগে নদ-নদী শাসন-সংক্রান্ত পরিকল্পনার সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এবং বিশেষ করে নদী ও সেচ বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টচার্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনঃপুনঃ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কপিল ভট্টচার্যকে তো কেন্দ্র পাকিস্তানি চর সাব্যস্ত করেছিলেন। ওদিকে জওহরলাল নেহরু বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করেননি। এতদিনে দেখা গেল তাদের হুঁশিয়ারী ও পরামর্শের সারবত্তা কতখানি ছিল।

শেষ প্রশ্ন

এবারকার বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও বিশালতা যে কেমন তা জেনেও কেউ এখনো বলছেন না, এই বন্যা প্রকৃতপক্ষে একটি জাতীয় বিপর্যয়। আমার অবাক লাগে যখন পশ্চিমবঙ্গেব প্রায় দু'কোটির বেশি মানুষ এই বিপর্যয়ের কবলে পড়েছেন, তখন মাসমিডিয়া একে ততখানি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেননি। কলকাতা শহর নির্লজ্জভাবে মেতে উঠেছিল শারদীয়া উৎসবের নেশায়। কলকাতা কী একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ? এবং দ্বীপটিই কী একটি নন্দনকানন, যেখানে শুধুই উর্বশীদের নৃত্যগীত? ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত আমি যে নরকে বাস করেছি সেই নরক থেকে মনে মনে

এখনো উদ্ধার পাইনি। বারবার মনে পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি ঐতিহাসিক বাণী, যার অর্থ দাঁড়ায়, যতদিন না বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় মানুষজনের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করছেন, তাদের সুখ-দুঃখের পাশে গিয়ে না দাঁড়াচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত বাঙালি জাতির উন্নতির কোন আশা নেই।

পরিশেষে, এই বন্যার যাবতীয় দিক বিভিন্ন সূত্রে বিচার বিশ্লেষণ করে আমার সন্দেহ হয়েছে, স্বাধীনতার প্রথম যুগ থেকেই দিল্লী মসনদে আসীন নেতারা পশ্চিমবঙ্গকে স্লো-পয়জন করে এসেছেন। বাঙালিকে দু'ভাগ করে বঙ্গভূমিকে দ্বি-খণ্ডিত করে ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বহুদিকে অগ্রসর এবং উন্নত বাঙালিকে পতনের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের এই বন্যা সেই সর্বনাশা গোপন স্লো-পয়জনেরই পরিণাম। মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গের নদনদী-শাসন প্রকল্প কেন্দ্রের হাত দিয়েই পঞ্চবার্ষিক যোজনার সূত্রে রূপায়িত হয়েছিল। আমার এ ধারণা অমূলক নয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর যখন আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে দিয়ে আমার গ্রামে পৌঁছেছিলাম, তখন কল্পনাও করিনি, আমার এই সুপরিচিত প্রিয় পথে আর কলকাতা ফিরতে পারব না। ৫ই অক্টোবর বহরমপুর পর্যন্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখেছিলাম রাস্তার দু দিকেই গ্রামগুলি তখনো জলমগ্ন। ৩৪ নং জাতীয় সড়কে পৌঁছে আমাদের যেতে হল সম্পূর্ণ উল্টো দিকে অর্থাৎ শিলিগুড়িগামী সড়ক ধরে। মোড়গ্রামের কাছে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে পানাগড় এক্সপ্রেস হাইওয়ে পেয়ে গেলাম। গাড়ি যাচ্ছিল ঘন্টায় নব্বই কি.মি বেগে। দু ধারে বীরভূমের তরঙ্গায়িত মাঠে সবুজ শস্যক্ষেত্র, তারপর অবাক হয়ে দেখলাম ব্রাহ্মণী নদী, দ্বারকা নদী, ময়ূরাক্ষী, তিলেপাড়া ব্যারেজ, অজয় নদ সব বালির চড়ায় ভরে আছে যত দূর চোখ যায়। ঐ সব নদনদীতে এবং মাঝে মাঝে জলবাহী নালা বা কাঁদর (কান্দার) প্রভৃতিতে একটুকুও জল নেই। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মরুভূমির মতো বালির চড়া। প্রচণ্ড অবাক হচ্ছিলাম, এই সব নদনদী ও কাঁদরের পথ দিয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর কোনো এক সময়ে সমুদ্রের মতো বিশাল জলরাশি অকস্মাৎ ছাড়া হয়েছিল নিকটবর্তী জলাধার থেকে। সেই সামুদ্রিক বিভীষিকা সুদূর পূর্বে ফেলে রেখে এই পথে যেতে যেতে অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, বালির চড়া বুকে নিয়ে সেই বিভীষিকার যাত্রাপথ যেমন নিরীহ মুখে আরামে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। (খোশবাসপুর থেকে বেরিয়ে ছিলাম সকাল সাড়ে সাতটায়। পানাগড়ের পর সবচেয়ে বীভৎস এবং ক্ষতচিহ্নে ভরা খানাখন্দ সংকুল জি.টি. রোড পেরিয়ে অবশেষে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে পেয়ে গেলাম। আবার গাড়ি চলল নব্বই কি.মি. বেগে। বালী ব্রিজ পেরিয়ে সিঁথি ও শ্যামবাজার হয়ে গোরাচাঁদ রোডে পৌঁছলাম বিকেল সাড়ে তিনটেয়। তারপর থেকে সেই বিভীষিকার স্মৃতি যতই ভুলতে চেষ্টা করছি ততবারই মনের মধ্যে নিষ্ফল ক্রোধ আমার অস্তিত্বকে বিব্রত করছে। কেন এখনো বলা হচ্ছে না এ একটা জাতীয় বিপর্যয়? কেন বলা হচ্ছে না, একদা দিল্লীর ঈর্ষাকাতর

মনসবদাররা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাঙালি জাতিকে নিঃশেষ করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন? বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নেহরুজি। কেন?

আর কেনই বা এই অভাবিত সামুদ্রিক বিভীষিকাকে মাসমিডিয়া থেকে শুরু করে দেশের সর্বস্তর ও সর্বদলের রাজনীতিকরা তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ? এও এক রহস্য।

কেন কেউ ভাবছেন না বা মুখেও বলছেন না, এই ভয়ঙ্করতম বন্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ডটাই এমন বীভৎসভাবে ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে যে এ রাজ্যের পক্ষে মুখ তুলে সোজা উঠে দাঁড়াতে এবং পা ফেলতে কত সময় লাগবে তা বলা কঠিন?

সৌজন্যে—দিশা সাহিত্য, ডিসেম্বর ২০০০